সাহিত্য পত্রিকা ॥ বর্ষ : ৫৫ ॥ সংখ্যা : ৩ ॥ জুন ২০১৮

মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পে আদিবাসী নারী

হোসনে আরা*

সারসংক্ষেপ: মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৩-২০১৫) অর্ধশতক ধরে গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, শিশুসাহিত্য নানাবিধ ধারায় সক্রিয় ছিলেন। পেশাগত কারণে বেশ কিছু বাণিজ্যিক রচনা প্রণয়ন করলেও তিনি কালজয়ী হয়েছেন ভারতবর্ষীয় ব্রাত্য মানুষ, বিশেষত আদিবাসী জীবনের কথাকার হিসেবে। সাংবাদিক হিসেবে দায়িত্ব পালন, ইতিহাস-প্রিয়তা ও প্রকৃত অর্থে মানবতাবাদী চেতনা তাকে আদিবাসী জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে রচিত তাঁর আদিবাসী-সম্পর্কিত গল্পগুলো বাংলা সাহিত্যে অভিনবত্বের আস্বাদ এনেছে। মহাশ্বেতা দেবী এ জনগোষ্ঠীর নিজস্বতাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন তাঁর গল্পে। তাঁর ছোটগল্পে বিধৃত আদিবাসী নারীর অবস্থা ও অবস্থানকে চিহ্নিত করাই এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র ঘরানার লেখক মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৩-২০১৫)। দীর্ঘকাল ধরে তিনি প্রান্তিক মানুষের জীবন-সংগ্রামকে তাঁর কথাসাহিত্যের অঙ্গীভূত করেছেন। সমাজের মূলস্রোতের একজন হিসেবে 'অপর' বলে প্রান্তে ঠেলে দেয়া মানুষের প্রতি প্রবল দায়বোধ; একইসঙ্গে তাদের সাম্যবাদী সামাজিক দর্শন এবং সহজ-সরল-আড়ম্বরহীন জীবনের প্রতি আকর্ষণ – এ দ্বিবিধ কার্যকারণ ক্রিয়াশীল থেকেছে তাঁর সাহিত্য-রচনায় পূর্বাপর। এ সূত্রে শ্রেণিবিভক্ত সমাজে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামোয় আদিবাসী নারীর অবস্থানকে এনেছেন মহাশ্বেতা তাঁর কিছু ছোটগল্পের অবয়বে। এ নারীচরিত্রগুলো কেবল নারী হিসেবে নয়, শ্রেণিবিভাজিত সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ততোধিক প্রান্তিক উপাদান হিসেবেই বিবেচিত হয়েছে।

১.১

আদিবাসী জীবনভিত্তিক মহাশ্বেতার উপন্যাস কখনও নারীচরিত্র প্রধান হয়ে ওঠেনি। একজন লেখক হিসেবে মহাশ্বেতা বরাবরই নারীসুলভ প্রবণতাগুলোকে এড়িয়ে চলেছেন সচেতনভাবে। তাঁর লেখার বিষয় তাই কেবল নারী জীবনের দুর্ভোগের কথকতা হয়ে ওঠেনি তেমনভাবে কখনও। অবশ্য তাঁর প্রথম রচনা (*ঝাঁসির রানী :)*

*সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

https://doi.org/10.62328/sp.v55i3.3

নারীজীবনকেন্দ্রিক – কিন্তু এ রানী কেবল একজন নারী নন, স্বাধীনতাকামী এক বিদ্রোহী শাসক, অস্ত্র হাতে যিনি পুরুষের পাশে থেকে পুরুষের মতোই যুদ্ধ করেছেন। ইতিহাস-সচেতন মহাশ্বেতা তাঁর রচনায় রানীর সে পরিচয়ই মুখ্য করেছেন – তাঁর নারী-জীবন নয়। পরবর্তীকালে আদিবাসী বিদ্রোহ এবং সামগ্রিকভাবে আদিবাসী জীবন তাঁর কথাসাহিত্যে প্রাধান্য পেয়েছে, বিশেষ করে আদিবাসী নারীর কথা কোথাও উচ্চকিত হয়নি।

মহাশ্বেতা অবলম্বিত প্রায় সব আদিবাসী গোষ্ঠীই পিতৃপ্রধান[১] – যেখানে নারীর সম্মান থাকলেও নীতিনির্ধারকের ভূমিকা নেই। সাঁওতাল সমাজে নারীকে ঘরের 'জিনিস কানা কু' অর্থাৎ সামগ্রী (শিপ্রা ২০০৯ : ৫৮) হিসেবে অভিহিত করা হয়, যদিও পারিবারিক জীবনে সব কাজে বা সিদ্ধান্তে তার মত জিজ্ঞেস করা হয়। তবুও পিতৃপ্রধান পরিবারে নারীর অবস্থান তো মূলত প্রান্তিক। আদিবাসী পুরুষেরা যেখানে ঋণের দায়ে বেঠবেগার বা শ্রমদাসে পরিণত হয়, নারীরা সেখানে কেবল শ্রমদাসী নয়, যৌনদাসী হতে বাধ্য হয়। আদিবাসী শ্রমজীবনে নারীর এ অবস্থানকে মহাশ্বেতা তাঁর কয়েকটি গল্পের কেন্দ্রে স্থান দিয়েছেন – 'দৌলতী', 'শনিচরী', 'রাজাবাসার রূপকথা', 'ইটের পর ইট', 'এজাহার' তেমন কিছু গল্প। তবে এ গল্পগুলোতে নাম ও কেন্দ্রীয় ভূমিকায় আদিবাসী নারীচরিত্র স্থান পেলেও, ব্যক্তিত্বময়ী কোনো নারী আসেনি, ব্যতিক্রম কেবল 'দ্রৌপদী' ও 'শিকার' গল্পদ্বয়।

১.২

উনিশ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধ মূলত বাংলা সাহিত্যের রোমান্টিক প্রাবল্যের যুগ – এ সময়ে নিম্নবর্গীয় জীবনও প্রধানত রোমান্টিক বাস্তবতায় পর্যবসিত হয়েছে বাংলা সাহিত্যে। মহাশ্বেতা রোমান্টিক বাস্তবতার অনুসারী ছিলেন না, তা নয় – লেখাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে লেখক-জীবনের প্রথম দিকে এ ধারায় তিনি বহু গল্প-উপন্যাস রচনা করেছেন। কিন্তু প্রাণের তাগিদে যখন তিনি কলম ধরেছেন, বিষয় করেছেন আদিবাসী এবং অস্পৃশ্য জীবন, তখন রোমান্টিকতা নয় বরং সংগ্রামশীলতাকেই বেছে নিয়েছেন। অত্যন্ত সাহসী এ লেখক সামাজিক দায়বোধে তাড়িত হয়ে অন্ত্যজ ও আদিবাসীদের সমস্যা-সংকটের সমাধান চান সকল মানুষের বিবেকবোধকে জাগিয়ে, তাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে। এ লক্ষ্যে তিনি তীব্র, তীক্ষ্ণ ভাষার অব্যর্থ তীরন্দাজিতে সচেতন মানুষের মননকে লক্ষ্য করে তাদের জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন আজীবন। তাঁর নির্মেদ, আপাত নির্লিপ্ত, কঠোর তীক্ষ্ণ ভাষা এবং বিষয়ের ভিন্নতা তাঁকে নারীলেখকের সীমিত গণ্ডি ছাড়িয়ে লেখক পরিচয়কে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অধিকাংশ রচনায় তাঁর নিজের ভূমিকা একজন ন্যারেটরের। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মিথের ঋদ্ধতায় তাঁর বক্তব্যধর্মী সাহিত্য পাঠকের মনোজগতকে আন্দোলিত করে। তাঁর রচনায় "তিনি রোমান্টিকের আবেগ ও কল্পনাপ্রবণতা, রিয়্যালিস্টের শুকনো বিশ্লেষণ এবং স্যাটিরিস্টের শাণিত বিদ্রূপ একসঙ্গে মেশানোর চেষ্টা করেছেন" (দীপেন্দু, উদ্ধৃত, রচনাসমগ্র, অষ্টম খণ্ড : ৫৫৩)।

২

গল্প-উপন্যাসের লেখক মহাশ্বেতার নবজন্ম ঘটে ষাটের দশকের শেষপর্বে। ঐ সময়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে সমাজতান্ত্রিকদের একাংশ ও সাধারণ নিপীড়িত মানুষের যৌথ বিপ্লব ঘটে গ্রাম-জনপদে ; তাতে বিপর্যস্ত হয় সমগ্র রাজ্যের প্রশাসন ও গ্রামীণ মহাজন শ্রেণি। পশ্চিমবঙ্গের সচেতন লেখক সমাজও এ ঘটনায় প্রভাবিত হয়েছেন সর্বাধিক – প্রতিষ্ঠিত একজন লেখক হিসেবে মহাশ্বেতা সামাজিক দায়বদ্ধতাকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়ে শোষিত, লাঞ্ছিত মানুষের কাছে নিয়ে গিয়েছেন নিজেকে এবং প্রথাবিরোধী বিপ্লবী বা নকশালদের প্রতি সহমর্মিতার বন্ধন অনুভব করেছেন। অথচ সর্বোচ্চ প্রশাসনও তখন নকশালদের নির্মূল করার জন্য রীতিমতো যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন (আগস্ট, ১৯৭০) : They (Naxalites) would be fought to the finish. (রামকুমার, ২০০০ : ৪-৮)[২] আইনের ঊর্ধ্বে পুলিশ বাহিনীকে স্থান দিয়ে প্রশাসন নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে নকশাল বিদ্রোহ দমন করেছিল, মানবতাবাদী লেখক হিসেবে মহাশ্বেতা তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে তার প্রতিবাদ করেছেন তীব্র তীক্ষ্ণ ভাষায়।

কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু (১৯৬৭) ও *অরণ্যের অধিকার (১৯৭৭)* মহাশ্বেতার আদিবাসী জীবন-নির্ভর উপন্যাসদ্বয় রচনার পেছনে ইতিহাসের প্রতি লেখকের অনুরাগ মুখ্য ছিল। *অরণ্যের অধিকার (১৯৭৭)* প্রকাশের পর আদিবাসীরা তাকে দেবীর আসনে বসায় এবং মহাশ্বেতাও প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন তাদের এবং সামাজিক দায়বদ্ধতায় আদিবাসী জীবনের অভাব-অভিযোগ, শোষণ -বঞ্চনার নিয়ামক হিসেবে তাদের জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করেন তাঁর গল্প- উপন্যাসে। এ সূত্রে ১৯৭৮-এ প্রকাশিত *অগ্নিগর্ভ* নামক গল্প-উপন্যাস সংকলনে প্রথম আদিবাসী জীবন নিয়ে মহাশ্বেতার গল্প পাওয়া যায় এবং যেন অবশ্যম্ভাবীভাবে তা হয় নকশাল আদিবাসী জীবনের বিদ্রোহকেন্দ্রিক এবং এ সূত্রে রচিত হয় 'দ্রৌপদী' গল্পটি।

২.১

সত্তরের দশকের শেষপর্বে 'দ্রৌপদী' (১৯৭৭) রচনার মধ্য দিয়ে তিনি এক অবিস্মরণীয় আদিবাসী নকশাল নারীচরিত্র গড়ে তোলেন – সমগ্র বাংলা সাহিত্য তার জুড়ি খুব বেশি নেই। নারীর চিরন্তন দুর্বলতা নগ্নতাকে তিনি শক্তি হিসেবে, বিদ্রোহ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এ গল্পে। কী বিষয়বিন্যাসে, কী ভাষার সূক্ষ্ম-বয়নে, কী এক্সপ্রেশনে – 'দ্রৌপদী' সমগ্র বাংলা সাহিত্যে অনবদ্য স্বাতন্ত্র্যের দাবীদার।

নকশাল সহযোগী দ্রৌপদী ও তার স্বামী দুলন মাঝি একটি আন্দোলন প্রতিরোধের জ্বলন্ত সময়ের প্রতীক হয়ে ওঠে মহাশ্বেতার গল্পে। সেনানায়ক ও তার সহযোগী কর্তৃক ধৃত এবং সমস্ত রাত ধর্ষিত হয়ে সকালে রক্তাক্ত নগ্ন দেহে দ্রৌপদী যখন প্রৌঢ় রণকুশলী সেনানায়কের সামনে এসে দাঁড়ায় প্রখর সূর্যালোকে, তখন সভ্যতার সমস্ত

কাঠামো যেন ধসে পড়ে। উপস্থিত সকলকে পুরুষ বলে অস্বীকার করে সে 'হেতা কেও পুরুষ নাই যে লাজ করব' (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ৪১৮) এবং দুই মর্দিত স্তনে সেনানায়ককে ঠেলতে থাকলে 'এই প্রথম সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়' (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ৪১৮)। নকশাল আন্দোলন, প্রশাসনের অত্যাচারের পাশবিকতা এবং এক প্রতীকায়িত সমাপ্তিতে সত্তরের জ্বলন্ত সময়কে শিল্পরূপ দেয়া হয়েছে এ গল্পে। গল্পের সমাপ্তিতে নগ্নতার সামাজিকতাকে দীর্ণ করে নারীশক্তির উন্মেষকে প্রতীকায়িত করেছেন মহাশ্বেতা। 'দ্রৌপদী' নামটিও তাৎপর্যপূর্ণ; সাঁওতাল সমাজে নামটি অপ্রচলিত – কেননা আদিবাসীদের যৌথজীবনে ব্যক্তিনাম মুখ্য নয় – তাই তারা সন্তানদের নামকরণ করে যেন তেন ভাবে – অধিকাংশ ক্ষেত্রে সপ্তাহের বিভিন্ন দিনের নামানুসারে। নামকরণের তথ্য গল্পকার প্রথমেই জানিয়ে দেন এ গল্পে। তথাকথিত উচ্চবর্গীয় জোতদার সূর্য সাহুর বউ দ্রৌপদীর নামকরণ করেছিল; জন্মদানের সময় তার মা এ বাড়িতে শ্রমিক হিসেবে কর্মরত ছিল – তাই নামকরণের মতো বিষয়টিও ফয়সালা করেছে মালিকপক্ষ। আর্যসভ্যতার বা সনাতন ধর্মের এক পুরাণাশ্রিত নামকরণের মাধ্যমে নারীশক্তির উদ্বোধনই এখানে ঘোষিত হয়েছে। পুরাণের দ্রৌপদী বস্ত্রহরণের লজ্জাকে প্রতিহত করতে শ্রীকৃষ্ণের সহায়তা প্রার্থনা করেছিলেন এবং তার বস্ত্রহরণ করা যায়নি। এ গল্পের দ্রৌপদী ধর্ষিত হয়ে বস্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করেছে – নগ্নতাকে সে লজ্জাকর মনে করেনি বরং প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছে – এ যেন হাজার বছরের ভীত, লজ্জিত নারী-অস্তিত্বের উজ্জ্বল মুক্তি। সরব না হলেও কালো দেহের নগ্ন রক্তাক্ত দ্রৌপদী নীরবে ভারতীয় ঐতিহ্যের শক্তির প্রতিভূ মা কালীর সঙ্গে সাযুজ্য স্থাপন করে। শক্তির এই মহাউত্থানের নির্ঘোষ জয়ধ্বনিতে যেন মুখরিত হয় গল্পের সমাপ্তি। অবশ্য মহাশ্বেতা নারীবাদী লেখকের খোলস কখনও গ্রহণ করেননি, সুতরাং সচেতনভাবে তিনি নারীশক্তির জয়ধ্বনি উচ্চকিত করেছেন – সে-ভাবনাকে বরং প্রসারিত করা যায় এ ভাবনায় যে, নগ্ন দ্রৌপদী এখানে নিরন্ন জনগণের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে এবং নিরন্ন মানুষের সম্মিলিত অকুতোভয় অগ্রসরে অত্যাচারী শোষক শ্রেণির প্রশাসনের বুক কেঁপে উঠেছে ভয়ে। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপটে 'দ্রৌপদী' গল্পের তাৎপর্য উল্লেখযোগ্য।

দ্রৌপদী নামকরণে সাঁওতাল সমাজে ব্যক্তি নামকরণের গৌণতার বিষয়টি ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ নামকরণ-সূত্রে সাঁওতাল সমাজেও নারীর অবস্থানগত তাৎপর্য মূল্যায়িত হয়েছে। বস্তুত যৌথ জীবনে ব্যক্তি গৌণ, সুতরাং তার নামও গৌণ – এ কথা সত্য, তেমনি শ্রেণিবিভক্ত সমাজের তলদেশে যাদের অবস্থান, কোনো রকমে বেঁচে থাকাই যাদের একমাত্র লক্ষ্য – তাদের জীবনে নামকরণের বৈচিত্র্য বিলাসিতা মাত্র। নিম্নবর্গীয় জীবনে নারীর নামকরণ হয় পুরুষের পরিচয়ে। কারো মেয়ে, বউ কিংবা মা – এ তিন পরিচয়ে পরিচিত হয় তারা। আদিবাসী জীবনের কোনো কোনো গোষ্ঠী মাতৃপ্রধান (গারো), সাঁওতাল সমাজ তা নয়। তবে সাঁওতাল

কিংবা অন্য কোনো পিতৃপ্রধান আদিবাসী গোষ্ঠীতেও নারীদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্র উন্মুক্ত থাকে। নারীর প্রতি সম্মান বা সমীহ কার্যকর থাকে প্রায় সব আদিবাসী জীবনে। আদিবাসী জীবনের নারীরা কেবল গৃহকোণে বন্দি নয়, পুরুষের পাশাপাশি জীবন-যুদ্ধে তারাও লড়ে ; ক্ষুধার অন্ন যোগাতে, সংসার গড়ে তুলতে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে। এ গল্পে তবুও দ্রৌপদীর সমান্তরালে কোনো নারীচরিত্র পাওয়া যায় না। তার সহযোগী একটি মাত্র চরিত্র মুসাই টুডুর বউ – যার নিজস্ব নাম উল্লেখিত নেই। দ্রৌপদীর ছদ্মনাম উপী – গতানুগতিক সাঁওতালি নাম। তার স্বামী দুলন এবং অন্যান্য পুরুষ নাম – বুধাই, সোমাইয়ের নামও গতানুগতিক। মূলত বারের নামানুসারে আদিবাসীদের নামকরণ হয়, যেমন – বুধবারে জন্ম হলে বুধনা, সোমবারে হলে সোমাই। দ্রৌপদী নামকরণের ব্যতিক্রমতা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর যৌথজীবনের বৈশিষ্ট্যকে পাঠকের দৃষ্টিগোচরে আনে। নামকরণ একটি সমাজের অর্থনৈতিক শ্রেণিগত অবস্থান, সে-সমাজের মানস-গঠন এবং বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করে থাকে। সাঁওতাল সমাজের কৌম বা গোষ্ঠীপ্রধান জীবন, অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা এবং শ্রেণিগত অবস্থানকে নির্দেশ করে গল্পকার দ্রৌপদী নামকরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন।

অনার্য দেবী কালীর প্রটোটাইপ আরোপ করে অনার্য সাঁওতাল রমণী দ্রৌপদীর মাধ্যমে মহাশ্বেতা নগ্নতার সামাজিক সমীকরণকে দীর্ণ করে নারী শক্তির উন্মেষ ঘটিয়েছেন এ গল্পে। তবে দ্রৌপদী চরিত্রে নারীত্বের চেয়েও আদিবাসী বৈশিষ্ট্য শক্তিশালী এবং আদিবাসী-জীবনের বিবিধ বৈশিষ্ট্যে বলীয়ান 'দ্রৌপদী' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অনন্য। আদিবাসীরা নিজস্ব গোত্রের শুদ্ধতা নিয়ে ভীষণ সতর্ক ও গর্বিত। নিজ সমাজের বাইরে তারা বিবাহ-সম্পর্কাদিতে যায় না। বিভিন্ন সময়ে বহিরাগতদের আক্রমণে কিংবা যুদ্ধকালীন সময়ে বিদেশি সৈন্যদের দ্বারা সাঁওতাল রমণী ধর্ষিত হলে কিছু মিশ্ররক্তের সন্তান জন্মায়। সাঁওতালরা তাদের সমাজে নিতে পারে না, আবার সাঁওতাল রমণীরা সন্তানের প্রতি সহমর্মিতাবশত তাদের ফেলেও দিতে পারে না। তবে এ সন্তানেরা অনেক সময় শুদ্ধ রক্তের ঐতিহ্য ও গর্বে আঘাত হানে। সাঁওতালদের জীবনে বেঈমানী বা বিশ্বাসঘাতকতার কোনো স্পর্শ নেই। দীর্ঘদিনের যাত্রাপথে নানা বিধি-নিষেধের বৃত্তে সাঁওতালরা আজও তাদের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন রেখেছে – এটি তাদের পরম গর্বের বিষয়। অন্য সব জাতির মতো সাঁওতাল বা অন্যান্য গোষ্ঠীও একসময় অন্য কোনো স্থান থেকে এসে এ ভারতভূমিতে অধিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের প্রাচীন ভূমির নাম চম্পাদেশ – নানা গল্প-গাথায় সে-ভূমি থেকে বর্তমান ভূমিতে তাদের অবস্থানের ইতিহাস, নিজেদের ঐতিহ্য ও সংস্কার নিয়ে গঠিত সাঁওতাল-জীবন। দ্রৌপদীর ভাবনায় তার বিচ্ছুরণ ঘটে –

> দোপ্‌দির রক্ত চম্পাভূমির পবিত্র কালো রক্ত, নির্ভেজাল। চম্পা থেকে বাকুলি, কত লক্ষ চাঁদের উদয়াস্তের পথ। রক্তে ভেজাল মিশতে পারত, দোপদির পূর্বপুরুষদের জন্যে গর্ব হল। তারা কালো কুঁচের কুচিলায় মেয়েদের রক্ত পাহারা দিত। সোমাই ও বুধনা জারজ। যুদ্ধের ফসল। শিয়নডাঙার মার্কিন সৈন্যদের উপহার টুওআর্ডস

> রাঢ়ভূমি। নইলে কাক যদি বা কাকের মাংস খায়, সাঁওতাল সাঁওতালকে ধরাতে হারামি করে না। (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ৪১৬)

ভীষণ নির্মম দৃপ্ত এ উচ্চারণ সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর দৃঢ়তা, ঐতিহ্য ও সংস্কারপ্রিতা এবং নিজ পরিচয়ের স্বাতন্ত্র্যে গর্বের সুরকে বহন করে একই সঙ্গে নারীর প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকেও স্পষ্ট করে।

২.২

ইটের পরে ইট (১৯৮২) গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত চারটি গল্প যথাক্রমে 'এজাহার', 'শনিচরী', 'রাজাবাসার রূপকথা', 'ইটের পর ইট' – প্রতিটি গল্পই নারী চরিত্রকেন্দ্রিক এবং প্রতিটি গল্পেই মূলত নারী নির্যাতনের ইতিবৃত্ত ধারণ করা হয়েছে। আদিবাসী-হরিজন সমাজের মানুষেরা প্রথাগতভাবেই উচ্চশ্রেণির দ্বারা শোষিত হয় যুগের পর যুগ। তাদের মেয়েরা নিগৃহীত হয় দু'ভাবে – এক শ্রেণিগতভাবে, দুই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নারী হিসেবে। সুতরাং নিম্নশ্রেণির এ নারীদের নিগৃহীত হওয়ার ঘটনাকে প্রাধান্য দিয়ে মহাশ্বেতা যে গল্পগুলো লিখেছেন সেগুলো কেবল নারী নির্যাতন নয়, শ্রেণি নির্যাতনেরও প্রত্যক্ষ দলিলরূপে বিবেচিত হতে পারে। 'এজাহার' তেমনি একটি গল্প। নকশালকর্মী দ্রৌপদীর পর ক্রান্তিদল ফৌজের কর্মী মুসাম্মিন দুসাদীনের উপর প্রশাসনযন্ত্রের পাশবিক নির্যাতনের এক প্রত্যক্ষ দলিল এ গল্প। অনেকটা স্যাটায়ারের ভঙ্গিতে রচিত এ গল্পের সমাপ্তিতে মূল পট উন্মোচিত হয়েছে। ধর্মভীরু দারোগা চতুর্বেদীর তথা সমগ্র প্রশাসনের নির্লজ্জ স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে গল্প-অন্তে। নারী নির্যাতন যে শোষক শ্রেণির দমন নীতির এক প্যাটার্ন, শ্রেণি নির্যাতনের অঙ্গ, লেখক সুকৌশলে তা আমাদের জানান এবং আরও জানান ধর্ষিতা নারীর আরও বিপদ ঘটে যে থানায়, তার কথা। ধর্ষিতা নারী দ্বিতীয় দফায় গণধর্ষণের শিকার হয় থানায়; এজাহার নেয়ার আরেক নাম – নারী নির্যাতন, সে সত্যটি উদঘাটন করেন লেখক কিছুটা তির্যক ভঙ্গিতে, কিছুটা কৌতুকময় ভাষায়। সমাপ্তিতে এ গল্পের সঙ্গে মোঁপাসার (১৮৫০-১৮৯৩) 'নেকলেস' (১৮৮৪) গল্পের সাদৃশ্য আছে; উভয় গল্পের অন্তিমে অপ্রত্যাশিত সত্য উদঘাটনের আকস্মিকতা বিমূঢ় করে পাঠককে।

'এজাহার' গল্পের চুম্বক চরিত্র মুসাম্মিন দুসাদীন আদিবাসী নয়, দুসাদ[২] বর্গভুক্ত। তবে মহাশ্বেতা পূর্বাপর হরিজন ও আদিবাসীদের অবস্থানকে একাকার করে উপস্থাপন করেছেন এবং এ গল্পেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। দুসাদ, গঞ্জু, ধোবি, রবিদাস, ঘাসি, পারহাইয়া, নাগেসিয়া – এদের তিনি একই পর্যায়ভুক্ত করে একত্রে উপস্থাপন করেছেন। রাজপুত প্রতাপ সিং তার বেঠবেগার কামিয়াদের চিড়মা কয়লা খনিতে নিয়ে গিয়ে কাজ করায় এবং শ্রমিক যেহেতু তার কামিয়া বেঠবেগার অর্থাৎ ঋণগ্রস্ত ক্রীতদাস, সেহেতু শ্রমিকদের মজুরি না দিয়ে তা জমা করে অসংগতরকম ধনী হয়ে ওঠে সে। এ অন্যায়ের প্রতিবাদে এক রাতদুপুরে বালি নাগেসিয়া প্রতাপকে হত্যা করে দেশান্তরী হয়। তখন হরিজন ও আদিবাসী সকলের ঘরে 'বালি' নাম রাখার ধুম পড়ে

যায়। এ বর্ণনায় লেখক আদিবাসী ও হরিজনদের যৌথ জীবনকে ইঙ্গিত করেছেন। আবার সিংদের কামিয়াদের বিবরণে বলছেন – 'ওদের গ্রামপঞ্চকে অনেক কামিয়া। দুসাদ, গঞ্জু, রবিদাস, ওঁরাও ঔর নাগেসিয়া, ঘাসি'(মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ২৬১)। শ্রেণিগত অবস্থান তাদের একীভূত করলেও বৈশিষ্ট্যগত দিক দিয়ে কিছু ভিন্নতা আছে, আর সে ভিন্নতাকে সন্তর্পণে গল্পের পরিসরে নির্দেশ করেছেন মহাশ্বেতা। পার্টির মদদধারী মাস্তান গণেশ সিং সরকার কর্তৃক খেতাবপ্রাপ্ত হয়, যখন সে চিড়মা খাদানে 'নকসাল মদতদার' সোর উঠিয়ে তিরিশজন আদিবাসী কুলিকে মেরে ফেলে। হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে সে সগর্বে মন্তব্য করে –

> আর মজুরির লড়াইও উঠাবে না, আর ফুল পরেও নাচবে না। সব বদমাশি খতম। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ২৬১)

দানবসদৃশ গণেশের এ আস্ফালনে ফুল পরে নাচা আদিবাসী নারীরা সংগ্রামের প্রতীক এবং সে সংগ্রামকে নিশ্চিহ্ন করার প্রচেষ্টার চিহ্ন ধরা পড়ে এ গল্পে।

২.৩

'শনিচরী', 'রাজাবাসার রূপকথা', 'ইটের পর ইট' – তিনটি গল্পের কাহিনি একসূত্রে গাঁথা। শাহরিক প্রয়োজন মেটাতে শহরের পাশের কৃষি জমি বন্ধ্যা করে যে অসংখ্য ইটভাটা গড়ে উঠেছে, তার মজুর হিসেবে নেয়া হয়েছে আদিবাসী নারীদের। আদিবাসীরা শ্রমিক হিসেবে দক্ষ, ফাঁকি দিতে জানে না। 'অলগখণ্ড' আন্দোলনে[৩] অংশ নেয়ায় প্রশাসনের বিরাগভাজন আদিবাসীরা কেবল পেটভরে খাওয়া ও পরনের কাপড়ের জন্য যে-কোনো মজুরিতে কাজ করে অনেকটাই ক্রীতদাস হিসেবে। আদিবাসী মেয়েরা দিনে শ্রম দিতে বাধ্য হয়, রাতে দেহ – কিন্তু কোনো পয়সা পায় না, সব মালিক মহাজন মধ্যস্বত্বভোগীরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। কখনও বছর শেষে এই মেয়েরা ঘরে ফেরে – কখনও হারিয়ে যায় চিরকালের জন্য। মালিকের রক্ষিতা হয়ে যৌবন শেষে কোনো আদিবাসী মেয়েই হয়তো সর্দারনি হয়ে আবার নতুন মেয়ের খোঁজে ফেরে নিজ অঞ্চলে। বাবা মাকে নগদ পঞ্চাশ টাকা, মেয়েটিকে নতুন একটি কাপড় দিয়ে, বহু টাকার স্বপ্ন দেখিয়ে ইট ভাটার মালিকের কাছে বিক্রি করে দেয় সামান্য টাকার বিনিময়ে। মধ্যস্বত্বভোগী সেই সর্দারনি হয়ে ওঠা আদিবাসী নারী হয়তো মাথাপিছু পায় দশ-বিশ কিংবা তিরিশ টাকা – মালিক ফায়দা তোলে লক্ষ টাকার। অর্থ ও ক্ষমতার সংঘবদ্ধ চক্রের বলি হয়ে শ্রমিক মেয়েটি তার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময় এবং সম্ভ্রম হারিয়ে, (কোনো ক্ষেত্রে জীবনও) কখনও ঘরে ফেরে একটা নতুন কাপড়, একটা রেলের টিকিট অথবা দিকুর[৪] সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে। উপর্যুপরি তিনটি গল্পেই কেবল নয়, বেশ কিছু কলাম এবং প্রবন্ধেও মহাশ্বেতা দেবী বারবার এ বিষয়টির প্রতি সচেতন মানবতার মমতাময় স্পর্শ কামনা করেছেন। 'বন্দিমুক্তি আন্দোলন চাই' (দৈনিক বসুমতী, ২৯.০৮.১৯৮১), 'সংগ্রাম কখনো ফুরায় না' (দৈনিক বসুমতী, ০১.০৫.১৯৮১) প্রভৃতি লেখায় মহাশ্বেতা

পশ্চিমবঙ্গের ইট ভাটায় কর্মরত শ্রমিক, বিশেষত নারী শ্রমিকদের বিষয়ে সরেজমিন তদন্তের ভিত্তিতে বিস্তারিত তথ্য জানিয়েছেন। এ সময়ই তিনি এ গল্পগুলো লিখেছেন – শিল্প রচনার তাগিদে নয়, বরং সামাজিক মানুষ হিসেবে নিজের বিবেকের কাছে দায়মুক্ত থাকার তাড়নায় এবং জনমত সৃষ্টির প্রেরণায়।

লেখকের ভাষায় –

> বাড়ি উঠেছে, প্রাসাদ উঠেছে, একটি একটি ইট বসিয়ে। এই ইটগুলি দাস শ্রমিকের রক্তে তৈরি। তাদের দুঃখের আগুনে পোড়ানো।
>
> এইসব বন্দিদের মুক্তি চাই, সেজন্য চাই আন্দোলন। এ আন্দোলন অনেক ধৈর্যে, অনেক পরিশ্রমে, অনেক নিষ্ঠায় গড়তে হবে। নইলে ইট ভাটার মজুর মেয়েদের উপর ব্রিটিশ আমলের চা-বাগান মার্কা শোষণ ও অত্যাচার থামবে না। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ৫৩৭)

এ গল্পত্রয়ের বিষয় ইট ভাটার বন্দি শ্রমিক হলেও তাদের আদিবাসী পরিচয়ের প্রেক্ষিতে তাদের ভাবনা, স্মরণ-বিস্মরণে আদিবাসী জীবনের বৈশিষ্ট্য, ঐতিহ্য এবং তাদের জীবনের ছাপচিত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

২.৩.১

'শনিচরী' গল্পের শনিচরী এক ওঁরাও মেয়ে। 'আদি জাতি রক্ষা মোর্চা'র লড়াইয়ের বাতাসে যখন জঙ্গলের জীবনে আগুন লাগে, তির-ধনুকে প্রতিরোধ তখন করতে পারে না আদিম জন-জাতি। মিলিটারি পুলিশ জ্বালিয়ে দেয় তাদের সব। বহু আদিবাসী জীবন দেয়, কিন্তু কোনো পরিবর্তন আসে না বরং জুলুম হয় আরও তীব্র। পুলিশের জুলুমে জঙ্গলে পালানো শনিচরী ও অন্যান্য তরুণী পরনের কাপড়ের জন্য গোহুমন বা গোখরার ছোবল খায় অর্থাৎ সর্দারনির ফাঁদে পড়ে ইট ভাটায় আসে। প্রথমে মালিকের শয্যা সহচর এবং পরে রেজা হিসেবে কাজ করে নয় মাস পর যখন একটা কাপড় ও রেলের টিকিট সম্বল করে সে গ্রামে ফিরে আসে তখন সে অন্তঃসত্ত্বা। সমাজের নিয়মে দিকুর সন্তান জন্ম দিয়ে সে সমাজ বহির্ভূত বিবেচিত হয়। তবুও বেঁচে থাকে, জীবনকে টেনে নিয়ে যায় জীবনের পথে।

আদিবাসী জীবনের গান নাচের প্রাচুর্য তাদের সম্পর্কে যে ধারণা তৈরি করে বাস্তবতা সম্পূর্ণ তার বিপরীত। শনিচরীদের জীবনে গান আছে, তবে তা দুঃখ-গাথা কেবল। ঘরে ঘরে কালো কালো দুঃখিনী মায়েরা গায় –

> আমার মেয়ে বাঁচত খেয়ে কান্দা মূল
> আমার মেয়ে পরত কানে পাতার দুল
> বনে গাছে শাড়ি ফলে না তো
> তাই তো মেয়ে বলল আমায়, মা গো !
> ইট ভাটাতে যাই ? মা গো, ইট ভাটাতে যাই ? (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ২৭৪)

দারুণ খরা, অজন্মায় যখন কোন শস্য ফলে না, বনে মেলে না কন্দমূল এবং অধিকারের লড়াইয়ে যখন মিলিটারি পুলিশ পোড়ায় ঘর-বাড়ি, পরনের কাপড় ; তখন জেনেবুঝেও গোখরা সাপের ছোবল খায় শনিচরীরা ; দূরের ইট ভাটায় যায় কাজ করতে, ফেরে দিকুদের সন্তান গর্ভে ধারণ করে। আদিবাসী সমাজের রীতি অনুযায়ী সামাজিক আইন বহির্ভূত কাজ করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, সমাজের সকলকে ভোজ দিতে হয়। শনিচরীও দেয় কিন্তু সন্তানসহ সমাজ তাকে গ্রহণ করে না। সন্তানকে ফেলে দিতে তারা বলে না, কেননা, 'হো ওঁরাও মুণ্ডা সাঁওতাল সমাজ শিশু ভালোবাসে' (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ২৭৭)। কিন্তু নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় বদ্ধপরিকর এ সমাজ কিছুতেই মিশ্ররক্তকে নিজ সমাজে ঠাঁই দেয় না। এ ধরনের সন্তানদের বিয়েও হয় না স্বসমাজে ; মিশ্র রক্তের অন্য কারো সঙ্গে বিয়ে হয় খাওয়াসিন রীতিতে – যা আদিবাসীদের কাছে অত্যন্ত ঘৃণ্য ব্যাপার। আদিবাসীরা তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতেই সামাজিক নিয়ম-কানুনে কঠোর। তাদের 'নাইগা' বা পুরোহিত স্বীকার করে শনিচরী নির্দোষ ; তবুও সমাজের নিয়ম ভাঙ্গার সাধ্য তার নেই।

২.৩.২

'রাজাবাসার রূপকথা' গল্পেও কাহিনি একই, প্রেক্ষাপট আলাদা। এ গল্পের স্থানিক পটভূমি কোলহান ; রাজাবাসা গ্রামের সার্জোম পূর্তি ও তার স্ত্রী জোসমিনা পাত্রপাত্রী। শোষকের ভূমিকায় যথারীতি মহাজন নন্দলাল সাহু ; ইট ভাটার বদলে শোষণস্থল পাঞ্জাবের জোতদার-গৃহ ; বাদবাকি সবই এক। সার্জোম, জোসমিনাকে চারশো টাকায় পাঞ্জাবের নিরঞ্জন সিংয়ের কাছে বিক্রি করে মধ্যস্বত্বভাগী নন্দলাল। দিনে ষোল থেকে আঠারো ঘণ্টার পরিশ্রম ক্ষেতে ও গৃহে ; জোসমিনার সম্ভ্রমহরণ – দিকুর সন্তান ধারণ করে পালিয়ে এসেও জাতিচ্যুত হবার ভয়ে জোসমিনার আত্মহত্যা সমস্তই পূর্ববর্তী গল্পের অনুরূপ। বস্তুত আদিবাসী মানুষগুলোর জীবনের এ সমীকরণ ভাঙতে পারেন না লেখক – তাই শুধু দায়বদ্ধতায় লিখে যান তাদের জীবনের কাহিনি, সত্য কাহিনি।

সার্জোম জোসমিনার জীবন কাহিনির পুনরাবৃত্তি ঘটে আদিবাসী জীবনে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে, ভিন্ন পটভূমিতে কিন্তু তাদের অন্তহীন দুঃখের কোনো সমাপ্তি ঘটে না। তাদের জীবন তাই রূপকথার জীবন – বেঁচে থাকাই তাদের জীবনের সবচেয়ে অলৌকিক ঘটনা।

২.৩.৩

'ইটের পরে ইট' গল্পে হো তরুণী জোসিন ইটভাটার কাজে যেতে বাধ্য হয় পুলিশ মিলিটারির জুলুমে। সুন্দরী তরুণী জোসিন ভাটার মালিকের বাঁধা মেয়েমানুষে পরিণত হয় এবং মালিকের পোষা গুণ্ডাদের অত্যাচারে মারা যায়। চুরির মিথ্যে অপবাদ প্রচার করে গুম করে ফেলা হয় তার মৃতদেহ এবং একসময় সে-লাশ আবিষ্কারে 'স্বরাজ' ইটভাটায় বিদ্রোহের প্রতিবাদের ঝাণ্ডা ওড়ে। পূর্ববর্তী গল্পদ্বয়ের কাহিনি অনুরূপ ; তবে

এ গল্পের বিস্তৃত পরিসরে লেখক আদিবাসী জীবন, তাদের ঐতিহ্য, ইতিহাস ও পরিচয়ের রেখাচিত্র টেনেছেন স্পষ্টভাবে।

৩.১

বন্‌ডেড লেবার বা দাসপ্রথার বিরদ্ধে লিখেছেন মহাশ্বেতা বহুদিন। ২৪ অক্টোবর ১৯৭৫ সালে অর্ডিন্যান্স জারি করে ভারতে বেঠ-বেগারী প্রথা বে-আইনি বলে ঘোষিত হয় কিন্তু বাস্তবে তা কার্যকর হয়নি। আদিবাসী এবং অন্ত্যজ সমাজের বড় অভিশাপ বেঠবেগারি প্রথা। সরল অক্ষরজ্ঞানহীন আদিবাসীরা পুরুষানুক্রমে বাঙালি, বিহারি এবং অন্যজাতির মহাজনদের কাছে ঋণগ্রস্ত থাকে। ভয়াবহ সেই ঋণের জাল – একবার তাতে আটকালে সাতপুরুষেরও সাধ্য নেই তা থেকে বেরোনোর। ক্রীতদাস প্রথার আরেক নাম যেন বেঠবেগারি। দাসপ্রথা সমগ্র ভারত জুড়ে বিভিন্ন নামে। অন্ধ্রের মাতাংগী, জাগ্‌গালি, মালাজাংগম, মাহার আর অন্যান্য জাতের মানুষেরা যখন দাস হয় তখন তাদের নাম হয় গোধী। বিহারের নাগেসিয়া, পারহাইয়া, দুসাদের নাম দেয় হয় কামিয়া বা সেওকিয়া। গুজরাটের চালওয়াডী, নালিয়া, ঠোরি ও অন্যরা হয় হালপাতি। কর্ণাটকের অন্ত্যজরা যখন দাস হয় তখন তাদের নাম জীথো, মধ্য প্রদেশে হয় হরোয়াহা। ওড়িশায় গোঠী আর রাজস্থানে সাগ্‌রি। তামিলনাড়ুর চেট্টি রায়তরা রাখে ভূমিদাস। উত্তরপ্রদেশে ভূমিদাসদের নাম মাত্ বা খাণ্ডিত-মুণ্ডিত বা সঞ্জায়ত। লাক্ষাদ্বীপের ভূমিদাসেরা হল নাদাপু। নাম যাই হোক প্রথাটি দাসপ্রথা ; বহু নামে তা বিদ্যমান সমগ্র ভারত জুড়ে। আদিবাসী, অন্ত্যজরা এ প্রথার বলি হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে।

দাস মজুরদের নিয়ে মহাশ্বেতার অনন্য গল্পগ্রন্থ *দৌলতি* (১৯৮৫)। এ গল্পগ্রন্থটির অন্তর্গত তিনটি গল্প – 'দৌলতি', 'পালামৌ' ও 'গোহুমনি'-র মূল উপজীব্য দাসমজুর প্রথা। তবে এ গল্পত্রয়ে আদিবাসী নারী দাসের প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

৩.২

পালামৌ জেলার সেওরা গ্রামের গনোরি নাগেসিয়ার মেয়ে দৌলতি। গনোরিকে সকলে বলে টেড়া নাগেসিয়া। কেননা চন্দেলা সিং-এর কামিয়া হিসেবে সে মালিকের ধান বোঝাই গাড়ি তুলতে গিয়ে শরীরের হাড় ভেঙ্গে গিয়ে টেড়া হয়ে গিয়েছিল। তিনশো টাকা কর্জ দিয়ে যে নাগেসিয়ার জীবনমরণের মালিক বনে গিয়েছিল চান্দেলা সিং, জনমভোর ক্রীতদাসের মতো বিনা পারিশ্রমিকে খাটিয়েও তার ঋণ কখনও শোধ করা যায় না। তবে গনোরির জীবনে ঘটে অত্যাশ্চার্য ঘটনা, যখন দেবতারূপে আবির্ভূত পরমানন্দ সিং তার সমস্ত কর্জ মিটিয়ে তাকে কামিয়া থেকে মুক্ত মানুষে পরিণত করে। বিনিময়ে সে বিয়ে করে গনোরির মেয়ে দৌলতিকে। ব্রাহ্মণ হয়ে আদিবাসী কন্যাকে বিয়ের নাটক সে করে বটে ; প্রকৃতঅর্থে সে দৌলতিকে কিনে নেয় তিনশ টাকার বিনিময়ে। বাবার পরিবর্তে কামিয়া হয় তার মেয়ে – এ এক অনিবার্য নিয়তি

আদিবাসী জীবনে। দৌলতিকে নিয়ে তোলে সে তার নিজস্ব পতিতালয়ে। দৌলতি, সোমনি, ঝালো, গোহুমনি আরও বহু আদিবাসী নারী – যাদের বাবা বা স্বামী পরমানন্দের কাছে ঋণগ্রস্ত – তারা নিজেদের সর্বস্ব দিয়ে সে ঋণ শোধ করে। বিনিময়ে পায় না পেট ভরে খাবারটুকু। কাপড়, জামা ও অন্যান্য যা কিছু খরচ হয় তাও তাদের মূল ঋণের সঙ্গে যুক্ত হয়, শোধ হয় না কিছুই। এখানে ক্ষমতার কেন্দ্রে অবস্থান করে মালিক পক্ষ এবং নারীর অবস্থান ক্রীতদাসী হিসেবে; তবুও ঋণ ও ঋণশোধের একটি প্রহসন অভিনীত হয় নিপুণভাবে।

১৯৬২ সালে তিনশ টাকা লগ্নি করে দৌলতিকে দেহব্যবসায়ে বাধ্য করে তার পারিশ্রমিক হিসেবে ১৯৭০ সালের মধ্যে পরমানন্দ তুলে নেয় চল্লিশ হাজার টাকারও বেশি। তবুও মূল তিনশো টাকা এবং জামাকাপড় বাবদ বায়ান্নো টাকা শোধ হয় না। পরমানন্দ মারা গেলে তার ছেলে বৈজনাথ হয় দৌলতিদের নয়া মালিক। সে আরও দ্রুত টাকা উপার্জনের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে দৌলতিদের। প্রতিদিন গ্রাহকের সংখ্যা বাড়িয়ে দেয় এবং খাবার খরচ ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে যায় – ফলে দৌলতির মতো মেয়েরা দুরন্ত যৌনব্যাধি ও ক্ষয়রোগে অকালে বিনা চিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করে। মৃত্যু অবধি তারা ঋণগ্রস্ত কামিয়া পরিচয়েই শ্রম দিয়ে যায় মালিক-মহাজনদের। দৌলতির মৃত্যুকে লেখক মহিমান্বিত করেছেন গল্পের অন্তিমে করুণ অথচ ঝাঁজালো বর্ণনায়। স্বাধীনতা দিবসে স্কুলের আঙিনায় আঁকা ভারতের ম্যাপের উপর পড়ে থাকে দৌলতির রক্তাক্ত শব –

> আসমুদ্র হিমাচল ভারত-উপদ্বীপের সবটুকু জুড়ে হাত-পা চিতিয়ে পড়ে আছে বনডেড লেবার, কামিয়া-রেণ্ডি দৌলতি নাগেসিয়ার নির্যাতিত, যৌনব্যাধি গলিত শব, ঝাঁঝরা ফুসফুসের সবটুকু রক্ত বমি করে।
>
> আজ, পনেরোই আগস্ট, স্বাধীনতা পতাকাদণ্ড প্রোথিত করার একটু জায়গাও দৌলতি মোহনদের ভারতবর্ষে রাখে নি। মোহন এখন কী করবে ? ভারত জোড়া হয়ে দৌলতি। (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৩ : ৩৭৯)

স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের জন্য স্কুলের আঙিনায় আঁকা ভারতের ম্যাপের উপর পড়ে থাকা দৌলতির রক্তাক্ত, পঁচন-ধরা শব প্রতীকী অর্থ বহন করে। সমগ্র স্বাধীন ভারত জুড়ে, কামিয়া, সেওকিয়া, বেঠবেগার, হরোয়ারা, চরোয়ারা বিভিন্ন নামে বিভিন্ন স্থানে দাস মজুর প্রথার অস্তিত্ব ঘোষণা করে দৌলতি।

৩.৩

'পালামৌ' গল্পের বাসমোতি গ্রামপ্রধানের ছেলে কর্তৃক সম্ভ্রম হারায় এবং কাটারি দিয়ে আক্রমণকারীর হাতে কোপ বসায়। এতে ভীষণ অবাক হয় উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের সকলেই। কেননা অন্ত্যজ ও আদিবাসী মেয়েরা চিরকালই উচ্চবর্গীয়দের ভোগ্য –

এটাই পালামৌয়ে নিয়ম। আর বন্ধুয়া[৪] বা ঋণগ্রস্তদাস হলে তো কথাই নেই। লেখকের ভাষায় –

> বন্ধুয়ার পরিবারের মেয়েদের ব্রাহ্মণ বা রাজপুত মালিক অবশ্যই ভোগ করবে। নিখরচায় ভোজ। রেণ্ডিবাড়ি গেলেও পয়সা দিতে হয়। এখানে সবই বিনামূল্যে।
>
> আর অন্ত্যজ মেয়েদের ধর্ষণকর্তা যদি ব্রাহ্মণ হয়, তাহলে নিয়ম একটাই। ঘরে বাতি থাকবে না। আলোতে অন্ত্যজকে দেখলে ব্রাহ্মণের জাত থাকে না। (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৩ : ৩৮৯)

তীব্র তির্যকতায় লেখক বাস্তবতাকে ব্যবচ্ছেদ করেছেন। বাসমোতির মা মালিকের ভোগ্য ছিল, মেয়ের নিয়তিও অনুরূপ হবে – তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই; বিস্ময় কেবল তা প্রতিরোধ করাতে। ভোগ্যবস্তুর মোটিফ হিসেবে নারীকে উপস্থাপন করেছেন মহাশ্বেতা সচেতনভাবে; শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শোষক শোষিতের অবস্থানকে চিত্রিত করেছেন তিনি এর মাধ্যমে।

বাসমোতির সাহসী মনোভাব যদিও তার জন্যে ইতিবাচক কোনো ফল নিয়ে আসে না। ছেলেবেলায় বিবাহিত বাসমোতিকে তার বর নানকু শহরে নিয়ে বিক্রি করে দেয় পতিতা হিসেবে এবং নিয়মিত তার রোজগারের অংশ ভোগ করে। গল্পশেষে অবশ্য বাসমোতি কৌশলে পালিয়ে আসে তার প্রণয়ী মাধো খারোয়ারের কাছে, যোগ দেয় বন্ধুয়া মুক্তি আন্দোলনে।

৩.৪

দৌলতি গল্পগ্রন্থের তৃতীয় গল্প 'গোহুমনি' – যার শাব্দিক অর্থ মাদী গোখরা সাপ। বিশাল ভুঁইয়ার বিধবাকে সবাই গোহুমনি বলে, তার প্রকৃত নাম ঝালো। নিজের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য গোখরা সাপের মতো প্রতিবাদে ফুঁসে উঠেছিল বলে তার নামকরণ হয় গোহুমনি। আদিবাসী অন্ত্যজ সমাজে ঘটনাটি ব্যতিক্রম – কেননা অন্ত্যজ মেয়েরা বরাবরই মালিক-মহাজনের কাছে নিজেদের সম্ভ্রম বিলিয়ে দিতে বাধ্য হয় – প্রতিবাদ, প্রতিরোধ হয় না কখনও। সে প্রেক্ষিতে ঝালো এক সাহসী নারী ভুজঙ্গের মতোই আত্মরক্ষায় প্রস্তুত।

দৌলতি গল্প সংকলনের ভূমিকায় লেখক 'গোহুমনি' গল্প সম্পর্কে তাঁর দুর্বলতার কথা জানিয়েছেন। ১৯৭৯/৮০ সালে পালামৌ জেলায় সংগঠন গড়ে বনডেড লেবাররা, ভারতে প্রথম। এরা আন্দোলনও করে। 'গোহুমনি' সেই আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা।

নারীদের কেবল যে দাস নয় বরং যৌনদাস হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে সে বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্যই এ গল্পগুলোর অবতারণা। এ প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন –

> দৌলতি, বাসমোতি, গোহুমনি নারী চরিত্রই বটে। কিন্তু শোষণ চলছে নরনারী শিশু নির্বিশেষে একটি শ্রেণির উপরেই, সে কথা আমি কখনো লিখতে ভুলিনি। লিঙ্গভেদ কারণে পৃথকীকরণ করিনি। আমি যা দেখেছি, দারিদ্র্য সীমারেখার নীচে। অবস্থিত সমগ্র সমাজটিই শোষিত (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৩ : ১০)।

৩.৫

নৈঋতে মেঘ (১৯৭৯) গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'শিকার' গল্পটি আদিবাসী নারী-চরিত্র প্রধান। আদিবাসী নারীর প্রতিশোধ নেয়ার কাহিনি এটি। গল্পের প্রধান চরিত্র মেরী ওঁরাও জন্মগতভাবে পুরোপুরি আদিবাসী নয়। তার মা ওঁরাও, বাবা অস্ট্রেলিয়ান সাহেব ডিক্সন। যদিও সে জীবন-যাপন করে আদিবাসীর ; কিন্তু আদিবাসী সমাজ তাকে নিজেদের বলে কাছে টেনে নেয় না, কোনো আদিবাসী ছেলেও তাকে বিয়ে করতে রাজি নয়। জালিম নামে এক মুসলমান ছেলেকে সে বিয়ে করবে বলে ঠিক করে। ঘটনাসূত্রে গ্রামে আগত ঠিকাদার তশীলদার সিং মেরীর অধিকার পেতে জোর খাটায়। শিকার পরবের রাতে মেরী তশীলদার সিংকে প্রলোভিত করে নির্জনে নিয়ে তাকে হত্যা করে। সবচেয়ে বড় শিকার নিষ্ঠুর মানুষকে কেটে টুকরো করে খাদে ফেলে সে পালিয়ে যায় তার প্রণয়ী জালিমের কাছে। মেরী যেন তার জন্মের প্রতিকার করে এ ঘটনার মাধ্যমে ; বিদেশিরা আদিবাসী মেয়েদের প্রলোভিত বা বাধ্য করে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে এবং তার ফল ভোগ করে মেরীর মতো দোআঁশলা সন্তানেরা – আদিবাসী সমাজ যাদের গ্রহণ করে না। এ কাহিনিকে সত্য বলে অভিহিত করেছেন মহাশ্বেতা, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের সঙ্গে কথোপকথনের[৫] এক পর্যায়ে তিনি বলেন –

> গল্পে যাকে মেরি ওঁরাও বলেছি, তাকে দেখেছি। বিহারেও আছে বাৎসরিক শিকার পরব। এ ছিল ন্যায় বিচার উৎসব। শিকারের পর সমাজপতিরা অপরাধীর বিচার করতেন, ওরা পুলিশের কাছে যেত না। সাঁওতালী ভাষায় এটা ল-বির্। 'ল' মানে আইন, 'বির' মানে জঙ্গল। আর বিহারে, প্রতি দ্বাদশ বৎসরে এটা 'জানী-পরব।' মেয়েদের শিকার উৎসব। ওই গল্পে বর্ণিত সকল ঘটনাই সত্য। সেদিন মেরি যা করে, ওখানে তা বারবার ঘটেছে। আদিবাসী সমাজে নারী ধর্ষণ, স্ত্রীলোককে অমর্যাদা, অবমাননা করা বৃহত্তম অপরাধ। ধর্ষণ ওরা জানে না। আদিবাসী সমাজে মেয়েদের সম্মান আছে। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১০ : ৫৬১)

৩.৬

সাঁওতালি ভাষায় হুল মানে বিদ্রোহ আর হুলমাহা মহাবিদ্রোহ। 'হুলমাহার মা' গল্পের কেন্দ্রে আছে মহনি নামক নারী – যার বাবা, স্বামী এবং পুত্র – তিন পুরুষের তিনজনই ঋণের দায়ে মহাজনের ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে। মহনির বাবা ছটরায় তার অনাগত সন্তানকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে মালিকের ধান বোঝাই গাড়ি উঠিয়ে মৃত্যুবরণ করে। স্বামী ভোমর নতুন করে ঋণগ্রস্ত হয়ে ক্রীতদাস হবার ভয়ে দেশান্তরী

হয়, আর পুত্র ছটরায় ক্ষুধার জ্বালায় ধানের বদলে নিজেকে বিকিয়ে দেয় মহাজনের কাছে। মহাজনের অন্যায় জুলুম, শোষণ-বঞ্চনা আর দাসপ্রথার বিরুদ্ধে যখন সিধু কানুর হুল শুরু হয় ; ছটরায় নিজেকে দাসত্বের শেকল থেকে মুক্ত করে হুলে যোগ দেয় এবং পীরপৈঁতির যুদ্ধে শহীদ হয়। মৃতছেলের কোমর থেকে দাসত্বের চিহ্ন শেকলটি নিয়ে মহনি ছোটে কামারদের কাছে – লোহার শেকলকে যুদ্ধের অস্ত্র তীর, বর্শায় পরিণত করতে। কাহিনিগ্রন্থিতে প্রতীকায়নের সুযোগ রয়েছে। চিরকালই দাসত্বের বন্ধন থেকেই বিদ্রোহের সূচনা হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, যুদ্ধের সহায়ক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত এ নারীকে হুলমাহার মা অভিধায় সম্মানিত করা হয়। গোর্কীর মায়ের সঙ্গে হুলমাহার মায়ের আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে। উভয়েই সমগ্র জীবন শোষণের শিকারে পরিণত হয়েছে এবং নিজ সন্তানের শোষণ-বিরোধী সংগ্রামে একাত্ম হয়েছে। এ গল্পটি মহনিকে কেন্দ্র করে রচিত হলেও সমগ্র গল্পে চরিত্রটি স্থবির থেকে গল্পের অন্তিমে কেবল জঙ্গম হয় মাতৃ-পরিচয়কে প্রকটিত করে।

৩.৭

মহাশ্বেতা দেবীর অসাধারণ একটি গল্প 'সাঁঝ সকালের মা' (১৯৭০) বিলুপ্তপ্রায় পাখমারা সম্প্রদায়ের এক চরিত্রের কাহিনি। পাখমারারা যাযাবর শ্রেণির, ঘর নেই তাদের, পাখি ধরে বেচে বলে তারা পাখমারা। সরকারি খাতায় তারা সংরক্ষিত উপজাতি। জটি এ সম্প্রদায়ের এক নারী। সম্প্রদায়গতভাবে অসাধারণ সৌন্দর্যের অধিকারী সে। পাখামারারা তাদের নিজস্ব গোত্রের বাইরে বিয়ে করে না; কিন্তু জটি, উৎসব কান্দোরীর ভালবাসার ডাকে সাড়া দিয়ে পালিয়ে তার সঙ্গে ঘর বাঁধে। কান্দোরীদের ব্যবসা চিকনপাটি বোনা। কান্দোরীর গৃহিণী হয়ে পাখমারা জটি প্রথম ঘরের স্বাদ পায় – যদিও তা স্থায়ী হয় বছর পাঁচেক। একমাত্র সন্তান সাধনের মুখপ্রসাদের অনুষ্ঠানে চোলাই মদ খেয়ে উৎসব মারা যায়। পাঁচ বছরের ছেলে নিয়ে জটি তার পাখমারা সম্প্রদায়কে খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয় এবং নিজেকে ও সন্তানকে বাঁচাতে সে আশ্রয় নেয় ধর্মীয় ও অলৌকিকতার বর্মে। নিজেকে ঠাকুরণী বলে প্রচার করে সে। দিনমানে সে জটি ঠাকুরণী – তখন সে সকল পারিবারিক সম্পর্কের ঊর্ধ্বে। সকাল ও সন্ধ্যায় সে মানবী – সাধনের মা ; সাঁঝ-সকালের মা।

ভক্ত ও শিষ্যের মাঝে নিজ সম্প্রদায়ের ঔষধি শিক্ষার গুণে অল্পদিনেই সে ঠাকুরণীর প্রতিষ্ঠা পায়। ওষুধ ও তাবিজের বদলে সে পয়সা নয়, চাল নিত। সে চালে সাঁঝ-সকালে ছেলেকে ভাত খাওয়াতো নিজে অনাহারে থেকে। একসময় অনাহার নামক প্রাচীন রোগেই সে মারা যায়। চিরন্তন মাতৃত্বের এ মহিমাকে মহাশ্বেতা অসাধারণ শৈল্পিক আঙ্গিকে ধারণ করেছেন এ গল্পে।

৪.

মহাশ্বেতার সৃষ্ট আদিবাসী চরিত্রগুলো কল্পিত নয় – কিছু ঐতিহাসিক এবং অধিকাংশই লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা জারিত। তাঁর গল্প-উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনাবলিও অধিকাংশ

বাস্তব পটভূমিতে নির্মিত। আদিবাসীদের শোষণ-বঞ্চনা, অভাব-নিরন্নতার বিবরণ লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত। এ সূত্রে তাঁর বেশ কিছু রচনায় রিপোর্টাজধর্মিতা লক্ষিত হয়। তবে সাহিত্যিকের চেয়ে সাংবাদিক পরিচয় খুব বেশি উচ্চকিত হয়ে ওঠেনি কখনওই। যদিও আদিবাসী জীবনের অন্দরমহলের কথাকার হয়ে ওঠার পেছনে তাঁর সাংবাদিক-বৃত্তি অবশ্যই সক্রিয় থেকেছে।

'দ্রৌপদী' গল্পে মহাশ্বেতা দেবী নারীত্বের বি-নির্মাণ ঘটিয়েছেন সত্য কিন্তু এ গল্পে দ্রৌপদী অনেকবেশি প্রতীকধর্মী। গল্পের অন্তিমে নগ্ন দ্রৌপদীর সেনানায়কের দিকে দৃপ্তপদে অগ্রসর হওয়া – বৃহত্তর অর্থে নিরন্ন, নগ্ন আদিবাসী বা অন্ত্যজ সমাজকেই প্রতীকায়িত করে – যারা অকুতোভয়ে সামনে পা বাড়ালে পেশীশক্তি, অস্ত্রশক্তির প্রতিভূরা ভীত হয়ে পিছু হটে। গল্পে কিছুটা এলেও আদিবাসী জীবনভিত্তিক কোনো উপন্যাসেই নারী-চরিত্র কেন্দ্রে স্থান পায়নি বা কোনো নারীর উপর বিশেষ আলোকসম্পাত করা হয়নি। মহাশ্বেতা অবশ্য বিভিন্নভাবে বারবার নারীবাদে নয়, মানবতাবাদে তাঁর প্রত্যয়ের কথা ব্যক্ত করেছেন। তিনি যেসময়ে তাঁর সাহিত্যিক-জীবন শুরু করেন, সে-সময়ে নারী-লেখককে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা হতো। শুরু থেকেই মহাশ্বেতা নারী-লেখক নন, কেবল লেখক হতে চেয়েছেন। সর্বদা সতর্ক ও সচেতন থেকেছেন নারীসুলভ ভাবালুতা কিংবা দুর্বলতা যেন তাঁর লেখায় প্রকাশিত না হয়। প্রথমাবধি তাঁর নারী চরিত্রগুলো তাই প্রথাগত নারীত্বের কাঠামোয় সীমাবদ্ধ নয় – 'ঝাঁসির রানী' লক্ষ্মীবাঈ একজন স্বাধীনতাকামী বীরযোদ্ধা, *হাজার চুরাশির মা*-এর সুজাতা কেবল সন্তানহারা মা নন, বরং সত্তরের উত্তাল সময়ের অস্থির রাজনীতি ও নৃশংস সময়ের একজন ন্যারেটর ; 'দ্রৌপদী' গল্পের দ্রৌপদী শোষিত জনতার প্রতীক। নারী-লেখক হিসেবে চিহ্নিত না হওয়ার সতর্ক সচেতনতাই সম্ভবত তাকে নিবৃত্ত করেছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী-জীবনের দ্বন্দ্ব-টানাপড়েন, তাদের সামাজিক-পারিবারিক প্রতিকূলতার বিপরীতে ব্যক্তি হয়ে ওঠার সংগ্রামী ইতিবৃত্তকে ধারণ করা থেকে । নারী নয়, শোষিত শ্রেণি হিসেবে তাঁর গল্পে এসেছে আদিবাসী নারী। কোথাও প্রতিবাদী, সংগ্রামীও হয়েছে – সেও নারী ব্যক্তিত্ব হিসেবে নয়, শ্রেণিগত অবস্থানে থেকেই। তাঁর সৃষ্ট প্রায় সব আদিবাসী নারী চরিত্র সম্পর্কেই কমবেশি এ কথা কার্যকর।

টীকা

১. মহাশ্বেতা দেবী অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসে সাঁওতাল, মুন্ডা, লোধা, ওঁরাও, কোল, নাগেসিয়া, হো প্রভৃতি গোষ্ঠীর জীবন অবলম্বন করেছেন এবং এ গোষ্ঠীগুলো পিতৃপ্রধান সমাজের অধিকারী। অর্থাৎ পিতাই এ পরিবারের প্রধান, তার নামে পরিবার পরিচিত এবং সম্পত্তির মালিকানাও তারই নামে।

২. 'দুসাদ' সনাতন ধর্মের শূদ্র গোত্রভুক্ত। তারা আদিবাসী নয়। তবে বর্ণগত দিক থেকে সনাতন ধর্মভুক্ত হলেও শ্রেণিগতভাবে তারা আদিবাসীদের সঙ্গে ঐক্য অনুভব করে।

৩. আলাদা রাজ্যের জন্য আন্দোলন করে আসছিলো আদিবাসীরা ১৯৪৭-এর পর থেকেই। এ আন্দোলন ঝাড়খণ্ড আন্দোলন নামেও সুপরিচিত। ২০০০ সালের ১৫ নভেম্বর স্বতন্ত্র রাজ্য হিসেবে ঝাড়খণ্ড-এর ঘোষণার মধ্য দিয়ে এ আন্দোলন পূর্ণতা পেয়েছে।

৪. বন্ধুয়া বা বন্‌ডেড্ লেবার প্রথা চালু ছিল সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। ২৪ অক্টোবর ১৯৭৫ সালে অর্ডিন্যান্স জারি করে ভারতে এ প্রথা বে-আইনি বলে ঘোষিত হয় কিন্তু বাস্তবে তা কার্যকর হয়নি।

৫. মহাশ্বেতা দেবী ও গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের কথোপকথন, 'সীগাল বুকস' থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক কর্তৃক মহাশ্বেতা দেবী রচিত চোট্টিমুণ্ডা এবং তার তীর গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ Chotti Munda and his arrow গ্রন্থে এ সাক্ষাৎকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অনুবাদ : কিশোরকুমার বিশ্বাস, গল্পসরণি, ষোড়শ বর্ষ : বার্ষিক সংকলন, মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা।

গ্রন্থপঞ্জি

১. কৃপাশংকর চৌবে (১৯৯৯)। *মহাঅরণ্যের মা*, ভাষান্তর : শংকর ঘোষ, প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা

২. ক্যাম্প (সম্পা. ১৯৯৮)। *অরণ্য-সন্তান শবর খেড়িয়া, মা-মহাশ্বেতা ও আরও কয়েকজন*, ক্যাম্প, কলকাতা

৩. গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক (১৪১৮)। 'ইতিহাস কথন', মহাশ্বেতা দেবী ও গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের কথোপকথন, 'সীগাল বুকস' থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক কর্তৃক মহাশ্বেতা দেবী রচিত *চোট্টিমুণ্ডা এবং তার তীর* গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ *Chotti Munda and his arrow* গ্রন্থে এ সাক্ষাৎকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অনুবাদ : কিশোরকুমার বিশ্বাস, গল্পসরণি, ষোড়শ বর্ষ : বার্ষিক সংকলন, মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা

৪. গিরিবালা দেবী (২০০৫)। 'সিংভূমের কোলজাতি', *বাংলা সাময়িকপত্রে আদিবাসীকথা*, দীপঙ্কর ঘোষ সম্পাদিত, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা

৫. দীপঙ্কর ঘোষ (সম্পা. ২০০৫)। *বাংলা সাময়িকপত্রে আদিবাসীকথা*, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা

৬. নির্মল ঘোষ (১৯৯৮)। *মহাশ্বেতা দেবী অপরাজেয় প্রতিবাদী মুখ*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা

৭. পার্থ চট্টোপাধ্যায় (১৯৮৭)। 'মহাশ্বেতা দেবী : নির্যাতিত মানবতার খোঁজে এক মানবী', কলেজ স্ট্রীট, ষষ্ঠ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা

৮. মহাশ্বেতা দেবী (২০০৩)। *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র, অষ্টম খণ্ড – দ্বাদশ খণ্ড*, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ২০০৪, *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র, ত্রয়োদশ খণ্ড – পঞ্চদশ খণ্ড*, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৯. শিপ্রা দত্ত (২০০৯)। *মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যে আদিবাসী জনজীবন*, অক্ষর পাবলিকেশনস্, কলকাতা

১০. শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় (১৪০৯)। *বাংলা উপন্যাসে 'ওরা'*, প্যাপিরাস সংস্করণ, প্যাপিরাস, কলকাতা

১১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (২০০৫)। 'কোল-জাতির সংস্কৃতি', *বাংলা সাময়িকপত্রে আদিবাসীকথা*, দীপঙ্কর ঘোষ সম্পাদিত, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা